এই পথ চলা

শুজা রশীদ

আমেরিকাঃ পূর্ব থেকে পশ্চিমে - ২

যখন ড্রাইভ করে ঘুরি তখন আমার একটা স্বভাব হচ্ছে পথে ‘রোড সাইড এট্রাকশন’ গুলো সব দেখতে দেখতে যাওয়া। এই জাতীয় দর্শণীয় বস্তুগুলো খুব বিখ্যাত না হলেও ঘুরে বেড়ানোর আনন্দটা বেশ কয়েক গুন বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু পরদিন মিনিয়াপোলিস যাবার পথে লম্বা ড্রাইভের কথা ভেবে ‘এট্রাকশন’ দেখা তো দূরে থাক, একমাত্র তেল নেয়া এবং খাবার কেনা ছাড়া কোথাও থামলাম না।

ডেট্রয়েট, মিশিগান

ইন্টারস্টেট ৯০ ধরে এগিয়ে চললাম। পথে মিশিগানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। ডেট্রয়েট মিশিগানের সবচেয়ে বড় শহর। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় অনেক স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ডেট্রয়েট থেকে মাইল ত্রিশেক উত্তরের ছোট শহর রচেস্টার হিলসে অবস্থিত ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে তিন বছর পড়াশোনা করেছি, কম্পিটার সায়েন্সে মাস্টার্স। দুই বছর পড়েছিলাম, আরেক বছর কো-অপ জব করেছিলাম।

পাশ করে চাকরী নিয়ে চলে যাবার পর কারো সাথেই আর তেমন যোগাযোগ নেই। কিন্তু পড়ার সময় প্রচুর বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে ফেলেছিলাম। অধিকাংশই অবশ্য ছিল ভারতীয় এবং হাতে গোনা কয়েকজন পাকিস্থানী। মনে পড়ে যায় প্রথম এসে একটা দুই বেডরুমের এপার্টমেন্টে আমরা ছয়জন থেকেছিলাম প্রায় বছর খানেক। দুই বেড রুমে দুই জন থাকত আর আমরা বাকীরা সব লিভিংরুমে কার্পেটে তোষক বিছিয়ে লাইন দিয়ে ঘুমাতাম। মাসে দুই শ' ডলার দিতাম। আমাদের সাথে এক পাকিস্থানী ছেলে ছিল। তার সাথে প্রায়ই খুটখাট লেগে থাকত। তার কথা শুনেই বুঝতাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে তার জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল। এই নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় মারপিট হতে যা বাকী থেকেছে।

ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস

বিশেষ করে মনে পড়ে ম্যাট গুরনসের কথা। সে ছিল আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। আইরিশ, শ্বেতাঙ্গ। তার একটা আদ্যিকালের ভ্যান গাড়ী ছিল। সেই গাড়ীতে সে আমাকে গাড়ী চালানো শেখায়। পরে আমি তাদের পারিবারিক গাড়ী - একটা ডজ অমনি - কিনে নেই পাঁচশ ডলারে। এটা ছিল স্টীক শিফট। ২৫০ হাজার মাইল। আমার আরেক রুম মেট ছিল রাজেশ। সে গাড়ী কিনবে। কিন্তু গাড়ী দেখতে নিয়ে যাবার মানুষ নেই। আমাকে বলল আমি যদি তাকে একটু নিয়ে যেতে পারি। একটা পুরানো গাড়ী নাকি তার খুব পছন্দ হয়েছে। তার আগে আমি কখন ফ্রিওয়েতে উঠিনি। স্থানীয় রাস্তায় গাড়ী চালাই। কিন্তু রাজেশের অনুরোধে রাজী হয়ে গেলাম। তখন শীতকাল। রাস্তায় বরফ পড়ে পিছলা হয়ে ছিল। ফ্রি ওয়ে পর্যন্ত যেতেও পারি নি। ওঠার মুখেই বরফে পিছলে একেবারে রাস্তার পাশে গাড়ী নিয়ে উলটে পড়লাম। রাজেশের কপাল কেটেছিল কিন্তু আমার কোন ক্ষতি হয় নি। কিন্তু গাড়ীটা জলাঞ্জলী দিতে হল। ইন্সুরেন্স ছিল শুধু লায়াবিলিটি। গাড়ীটা হারিয়ে খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। হাতে টাকা পয়সা ছিল না যে আরেকটা গাড়ী কিনব।

মনে পড়ে মুর্তি দার কথা। আমার চেয়ে বয়েসে বেশ বড়। এসেছিলেন পি এইচ ডি করতে। তাকে আমি শিখেয়িছিলাম গাড়ী চালাতে। ভদ্রলোক খুব নার্ভাস হয়ে থাকতেন এবং প্রায়ই গাড়ী চালাতে চালাতে ভয় কাটানোর জন্য হেঁড়ে গলায় গান গাইতে শুরু করতেন। তার পাশে বসে আমার হৃতকম্পন বেড়ে যেত। না জানি কার গায়ে গিয়ে গাড়ী তুলে দেয়।

ভেবেছিলাম যদি একটু সময় পাই তাহলে ঝট করে ইউনিভার্সিটি থেকে ঘুরে যাবো। পরিচিত কেউ আছে কিনা জানা নেই কিন্তু স্কুলের ভেতরে একটু ঘুরতেও ভালো লাগত। এতো সুন্দর ছিল প্রাংঙ্গনটা! প্রায়ই হরিণের দল বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলাফেরা করত।

সময়ের অভাবে এই যাত্রায় আর সেই দিকে যাওয়া হল না।

মিনিয়াপোলিস, মিনেসোটা

মিনিয়াপোলিসে যখন মোটেলে পৌঁছালাম তখন বেশ রাত। দীর্ঘ সময় ড্রাইভ করে ক্লান্ত হয়ে ছিলাম। কোন রকমে মোটেলের পাশের একটা রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু একটা খেয়ে নিয়ে গোসল সেরেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রায় ষোল ঘন্টার মত গাড়িতে ছিলাম। অভ্যাস নেই। শরীরে ব্যাথা হয়ে গেছে। দূর পাল্লার ট্রাক যারা চালায় তারা কিভাবে দিনের পর দিনে সারা দিন ধরে ড্রাইভ করে কে জানে। পরদিন সকালে মিনিয়াপোলিস ইউনিভার্সিটিতে মেয়েটার সাথে দেখা করত যাওয়ার কথা। সেটা তাড়াতাড়ি সেরে আবার আমার যাত্রা শুরু করতে চাই। অনেক ইন্টারেস্টিং জায়গা পড়ে আছে সামনে। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা – ইস্ট ক্যাম্পাস

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম খুব রৌদ্রজ্জ্বল একটা দিন। ভ্রমনের জন্য চমৎকার দিন। দ্রুত দাঁত ব্রাশ এবং শেভ করে জামা কাপড় পড়ে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার উদ্দ্যেশ্যে। পথে এক দোকানে থেমে কিছু ফুল কিনে নিলাম। সেন্ট পল এবং মিনিয়াপোলিস এখানকার দুটি বড় শহর, প্রায় পাশাপাশি, যে কারনে তাদেরকে টুইন সিটি বলা হয়। ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার যথেষ্ট নাম ডাক আছে। ক্যাম্পাস্টা খুঁজে বের করতে কিছু সময় গেল। রাস্তা ঘাট খুঁজে পাওয়া নিয়ে সব সময়েই একটু সমস্যার মধ্যে থাকি। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির হাউজিং বিল্ডিঙগুলো খুঁজে পেলাম। পার্কিং লটে গাড়ী রেখে বাইরে বেরিয়ে এসে আমার টনক নড়ল। একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে এসেছি। তাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াটাই তো রীতি। কিন্তু আমার গাড়ীতে ড্রাইভারের সীট ছাড়া আর সব স্থানই মালপত্রে ভর্তি। যার অর্থ গাড়ীতে কাউকে তোলা সম্ভব হবে না। মোটেলে হয়ত কিছু রেখে আসা যেত কিন্তু আবার মালপত্র নামানোর চিন্তা মাথাতে আসেই নি। যা হবার হবে। এখন আর চিন্তা করে কি লাভ?

উইসম্যান আর্ট মিউজিয়াম, ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা

মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে দেয়া এপার্টমেন্ট নাম্বারটা খুঁজে বের করলাম। কলিং বেল বাজাতে একটি সুদর্শনা তরুণী দরজা খুলে দিল। তার বয়েস মনে হল বাইশ তেইশ হবে। তার সাথে আরেকজন তরুণকে দেখলাম, যার বয়েস আরেকটু বেশী মনে হল। আমার আসার কথা তাদেরকে আগেই জানানো হয়েছিল সুতরাং তারা আমাকে আশা করছিল। কিন্তু আমার কাছে মেয়েটার কোন ছবি ছিল না। এই মেয়েটির সাথেই পরিচিত হতে এসেছি কিনা বুঝতে পারলাম না। তাই বাধ্য হয়ে বিনীতভাবে নিজের পরিচয় দিলাম। তারা আমাকে লিভিংরুমে বসতে বলে চলে গেল। মিনিট খানেক পর আরেকটি মেয়ে, যার বয়েস মনে হল বিশের উপর হবে না, সুন্দরী, সপ্রতিভ, লিভিংরুমে এসে ঢুকল। সে তার পরিচয় দিল। তার নাম জিনিয়া। বুঝলাম এই মেয়েটির সাথেই দেখা করতে এসেছি। আমরা সেখানে অল্প কিছুক্ষন আলাপ করলাম। তার সাথে কথা বলে ভালো লাগল যদিও মনে হল আমি যা আশা করেছিলাম তার বয়েস তার চেয়ে যথেষ্ট কম।

আমি একসাথে লাঞ্চ করবার প্রস্তাব দিলাম। স্বাভাবিকভাবেই তারা আশা করেছিল আমি জিনিয়াকে আমার গাড়িতে করে নিয়ে যাবো। তার রুমমেট দু' জনের আমাদের সাথে আসার কোন প্ল্যান ছিল না। আমি লজ্জিতভাবে তাদেরকে আমার গাড়ির ভেতরের স্থানের স্বল্পতার কথা বললাম। তারা ইতিমধ্যে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে তারা স্বামী-স্ত্রী। তাদেরকেই অনুরোধ করলাম জিনিয়াকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে আসার জন্য। তারা প্রথমে খুব একটা আগ্রহ না দেখালেও যখন বুঝল আমি সম্ভবত সত্য কথা বলছি তখন আর কোন আপত্তি করল না।

আমরা সবাই মিলে কাছেই অবস্থিত একটা পিজ্জারিওতে গেলাম। আমি অনেক কিছু অর্ডার দিতে চাইলাম কিন্তু তারা কেউ তেমন কিছু খেতে চাইল না। আমরা চা-নাস্তা জাতীয় কিছু খেলাম। কথা বার্তা মোটামুটি হল। সেখান থেকে তারা আমাকে নিকটবর্তি একটা পার্কে নিয়ে গেল। আমরা সবাই আলাপে এমন মশগুল হয়ে গেলাম যে মনে হল তাদেরকে আমি যেন কত যুগ ধরে চিনি।

ঘন্টা খানেক কাটিয়ে আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমাকে পথে নামতে হবে। সেই দিন আমার সাউথ ডাকোটার র‍্যাপিড সিটিতে গিয়ে নোঙর ফেলার কথা। ছয় শ' মাইলের মত ড্রাইভ, কম করে হলেও। ইতিমধ্যেই দুপর দুইটার মত বেজে গেছে। রাতে ড্রাইভ করতে পছন্দ করি না। বিদায় নেবার এটাই সময়।

আবারও পথ হারিয়ে কিছুক্ষন ঘোরাঘুরি করে সময় নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত এক্সপ্রেস ওয়ে খুঁজে পেয়ে যখন উঠে ভোঁ করে গাড়ী ছুটিয়ে দিলাম তখনই বুঝলাম আজ আর র‍্যাপিড সিটি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে না। সন্ধ্যার পর আমি নিতান্ত বাধ্য না হলে ড্রাইভ করছিলাম না। অচেনা অজানা জায়গা, কোন রকম বিপদে আপদে পড়লে সমস্যায় পড়ে যাবো। বেশী ভয় ছিল গাড়ী নিয়ে। হাজার হোক যন্ত্র, সমস্যাতো হতেই পারে। আমি র‍্যাপিড সিটিতে যে মোটেলে আগেই রুম রিজার্ভ করে রেখেছিলাম সেখানে ফোন করে রিজার্ভেশন বদলে পরের দিন করে নিলাম। ঠিক করলাম ড্রাইভ করতে করতে যখন মনে করব রাতের জন্য থামা দরকার তখন সবচেয়ে নিকটবর্তি কোন শহরে থেমে হোটেল কিংবা মোটেল কিছু একটা খুঁজে নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। ধরে নিলাম যদিও গ্রীষ্ম এবং এই সময় সাধারণত মোটেল পাওয়া কঠিন তারপরও এই সমস্ত এলাকায় প্রচুর হোটেল এবং মোটেল আছে। সুতরাং একটা কামরা পাওয়া খুব সমস্যা হবার কথা নয়। সময় যখন এলো তখন টের পেলাম, আমার ধারণা কতখানি ভুল ছিল।